Vol. 53 | No. 1 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় প্রভাব

Volume	53
Issue	1
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Md. Abdus Sobhan Talukder
Published online	October 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v53i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i1.5
Pages	১২১-১৩৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় প্রভাব

মো. আবদুস সোবহান তালুকদার*

পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের ধারায় নানা স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতার দাবিদার। অচ্যুত গোস্বামীর বিবেচনায় এ গ্রন্থটি "মানিকবাবুর শিল্প হিসাবে সবচেয়ে সার্থক বই।" (অচ্যুত, ১৯৬৮ : ৩৫৯) আবুল ফজলের মতে *পুতুলনাচের ইতিকথা* "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কীর্তি।" (ফজল, ২০০১ : ১৫) তাঁর উপলব্ধি : "বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস অনেকখানি এগিয়ে গেছে সত্য, কিন্তু মনে হয় পুতুলনাচের ইতিকথা আজো রয়ে গেছে অনতিক্রম্য।" (ফজল, ২০০১ : ১৭)

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসেই মানিক প্রথম তাঁর ফ্রয়েডীয় তত্ত্বাশ্রিত জীবনকথাকে যথার্থ দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিতে পরিপূর্ণভাবে স্থাপন করেছেন। *দিবারাত্রির কাব্যে* মানিক মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ নির্মাণ করে দেখিয়েছেন : তাদের যাপিত জীবনব্যাখ্যায় ফ্রয়েড কতোটা প্রাসঙ্গিক ; *পদ্মানদীর মাঝিতে* আঞ্চলিক জীবনচিত্র এঁকে দেখিয়েছেন : সেখানেও ফ্রয়েডীয় জীবনব্যাখ্যা কার্যকর ; তারপর যথার্থ দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিতে *পুতুলনাচের ইতিকথা* নির্মাণ করে ওই জীবন বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিলেন : ফ্রয়েডীয় লিবিডোই অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে মানুষকে পুতুল নাচ নাচায়। *দিবারাত্রির কাব্যে* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করেছেন, *পদ্মানদীর মাঝিতে* ফ্রয়েড দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জনজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক হলেও গৌণ ; *পুতুলনাচের ইতিকথায়* বহুধাবিভক্ত উপকাহিনীর ভিড়ে ফ্রয়েড কেন্দ্রীয় চরিত্রদুটির প্রধান নিয়ামক শক্তি। অচ্যুত গোস্বামীর মতে বাংলা উপন্যাসের ধারায় *পুতুলনাচের ইতিকথাই* প্রথম গ্রন্থ, যেখানে ফ্রয়েডীয় অবচেতন মনের 'প্রথম সার্থক চিত্রায়ণ' ঘটেছে। তাঁর ভাষায় :

> পুতুল নাচ বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় অবচেতন মনের প্রথম সার্থক চিত্রায়ণ। ... ইংরাজী সাহিত্যের ডি. এইচ. লারেন্সের ভূমিকা বাংলায় মানিকবাবু গ্রহণ করেছিলেন। (অচ্যুত, ১৯৬৮ : ৩৬০)

---

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর যে-সব গ্রন্থে ফ্রয়েডীয় জীবনদর্শন সংস্থাপন করেছেন, তার ভেতর *পুতুলনাচের ইতিকথাই* সবচেয়ে বেশি বাস্তবসম্মত বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে যে দেশ-কাল-পরিপ্রেক্ষিতের যথার্থ রূপায়ণের জন্য, সেই বহির্বাস্তবতা কতখানি 'বাস্তব জীবনসম্মত' ও 'যথার্থ', তা সমালোচকের কাছে প্রশ্নাতীত নয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপলব্ধি :

ক. পুতুলনাচের ইতিকথায় বাস্তবতার প্রসার কিছু বেশি কিন্তু অসংলগ্নতা প্রায় পূর্ববৎই রহিয়াছে। (শ্রীকুমার, ১৯৮৮ : ৫১৪)

খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' দুইখানি উপন্যাসের মধ্যে অসংলগ্ন অবাস্তবতার সহিত আশ্চর্য পরিণত চিন্তাশীলতা ও বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। (শ্রীকুমার, ১৯৮৮ : ৫১৩)

আকিমুন রহমানের মতে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'মানুষের অন্তর্গত বিকার আবিষ্কার করেন সর্বত্রই'। (আকিমুন, ১৯৯৩ : ২৮৮) তাই মানিক *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসে "স্বাভাবিক পল্লীর পটভূমিতেই উপস্থাপিত করেছেন একরাশ অস্বাভাবিক চরিত্র" (আকিমুন, ১৯৯৩ : ২৮৭)

আকিমুন রহমান বলেছেন : "বাস্তবপ্রতিবেশ পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু সারা উপন্যাসে বাস্তবতারূপে উপস্থাপিত হয়েছে ব্যক্তিমানুষের অস্বাভাবিক জীবন।" (আকিমুন, ১৯৯৩ : ২৮৮)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় যে 'অসংলগ্ন বাস্তবতা' লক্ষ করেছেন, এবং আকিমুন রহমান বাস্তব প্রতিবেশে উপস্থাপিত যে অস্বাভাবিক জীবনধারা খুঁজে পেয়েছেন, তার মূলে রয়েছে ফ্রয়েডীয় প্রভাব। গ্রামীণ জীবনকে শরৎচন্দ্র বা বিভূতিভূষণ কিংবা তারাশঙ্কর যেভাবে দেখেছেন, মানিক সেভাবে দেখেননি। মানিক গণ্ডগ্রাম গাওদিয়ায় লিবিডোর টানাপোড়েন লক্ষ করেন বলে সে গ্রাম আর শরৎ-বিভূতি-তারাশঙ্করের সহজ-সরল গ্রাম থাকেনি।

জীবনের সমস্যা ও তার রূপায়ণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমাবধি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপকার। তাই তাঁর কাছে "বাইরের ঘটনাগুলি রোগের লক্ষণ মাত্র ; রোগের অনুসন্ধানে তিনি মানব-মনের অনেক গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তিনি আবিষ্কার করেছেন এক অন্ধ ক্লিষ্ট জৈবিক শক্তির বিকৃত অপ্রকাশের মধ্যেই রোগের উৎস বিদ্যমান।" (অচ্যুত, ১৯৬৮ : ৩৬১) ... "মানিকবাবু দেখালেন, সমস্যা অত সরল নয়। মানুষের ইচ্ছাকেও নিয়ন্ত্রিত করছে অন্ধকার গুহাবাসী এক বিরাট জৈবিকশক্তি। বাজিকর যেমন পর্দার আড়ালে বসে অদৃশ্য সুতোর সাহায্যে পুতুলদের নাচায়, তেমনি এক অন্ধ জৈবিক শক্তি মানুষ-পুতুলদের নাচিয়ে বেড়াচ্ছে।" (অচ্যুত, ১৯৬৮ : ৩৫৯)

ইতঃপূর্বে লিখিত উপন্যাস *পদ্মানদীর মাঝিতে* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট নির্মিতিতে যতোখানি সচেতন ছিলেন, *পুতুলনাচের ইতিকথায়* তিনি ততোটা সচেতন ছিলেন, এমন বলা যাবে না। এর কারণ হিসেবে অচ্যুত গোস্বামী যে মত প্রকাশ করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য :

> ... লিখতে গিয়ে তিনি (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) ক্রমশ এই উপলব্ধিতে পৌঁছলেন, অর্থনীতিটা মানুষের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেটা তার বহিরঙ্গের ব্যাপার, মানুষের অন্তর্জীবনের নিয়ামকশক্তি অর্থনৈতিক নয়, যৌন কামনা। সেই জন্য 'পদ্মানদীর মাঝি'তে অর্থনৈতিক জীবনের উপর যেটুকু গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, 'পুতুলনাচের ইতিকথায়' তা-ও নেই। (অচ্যুত, ১৯৬৮ : ৩৬০)

পুতুলনাচের ইতিকথার কেন্দ্রীয় চরিত্র শশী ডাক্তার ও কুসুম। এ চরিত্রদুটির অন্তর্জগৎ নির্মিতিতে, তাদের জীবনতৃষ্ণার রূপ-রূপায়ণে, এবং তাদের স্বপ্নভঙ্গের দাহে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব নানামাত্রিকভাবে প্রাসঙ্গিক। এ উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে, তিনি কেবল কয়েকটি ফ্রয়েডীয় চরিত্র নিয়েই উপন্যাস ফেঁদে বসেননি, ফ্রয়েডনিরপেক্ষ বেশ কিছু চরিত্র এবং মূল কাহিনির বলয়ের ভেতরেই বেশ কয়েকটি উপকাহিনি এখানে রূপায়িত হয়েছে। কুমুদ-মতি, জয়া-বনবিহারী, সেনদিদি-যামিনী কবিরাজ, যাদব-পাগলদিদি, বিন্দু-নন্দলাল উপকাহিনি ছাড়াও রয়েছে গোপাল দাস ও পরান ঘোষের মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু চরিত্র, যারা মূলত গাওদিয়া-বাজিতপুরের বহির্বাস্তবতা নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

মতি ও কুমুদের পারস্পরিক ভালোবাসা, জয়া ও বনবিহারীর দাম্পত্যজটিলতা, শশী ডাক্তারের প্রতি মতির দুর্বলতা, মতির প্রতি শশী ডাক্তারের আগ্রহ, মতির প্রতি কুসুমের ঈর্ষাকাতরতা এবং গোপাল দাসের সঙ্গে সেনদিদির সমাজনিন্দিত সম্পর্কের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব। তবে আমাদের বর্তমান আলোচনায় আমরা কেবল কুসুম ও শশী ডাক্তারের আন্তঃসম্পর্কের ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণের ভেতর সীমিত থাকতে চাই।

গাওদিয়া গ্রামের কৃষক পরান ঘোষের বন্ধ্যা স্ত্রী কুসুমের বয়স তেইশ। গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন মহাজন গোপাল দাসের একমাত্র পুত্র শশী কলকাতার কলেজ থেকে পাস করা ডাক্তার। গ্রামেই সে প্র্যাকটিস করে। ডাক্তারির সুবাদে গ্রামের সব বাড়িতেই তার অবাধ যাতায়াত, এবং তার আচার-ব্যবহার মধুর বলে গ্রামে তার সুনামও আছে। ছোটবাবু নামে সবাই তাকে চেনে, জানে ও মানে।

কুসুমের আচার আচরণ অনেকটা অপ্রকৃতিস্থ। দাম্পত্যজীবনে অসুখী নারীরা কিছুটা পাগলাটে ধাঁচের হয় এবং এদের অনেকেই হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্ত হয়ে থাকে বলে ফ্রয়েড উল্লেখ করেছেন (অরূপরতন, ১৯৯৯ : ৬৫, ১৪৯)।

কুসুম একান্তভাবেই ফ্রয়েডীয় নারী। পাড়ার লোকের 'বৌ তোমাদের যেন একটু পাগলাটে, না গো পরানের মা?' শ্লেষাত্মক প্রশ্নের উত্তরে পরানের মা মোক্ষদা অকপটে বলে : 'একটু কেন মা, বেশ পাগল – পাগলের বংশ যে।' অথচ কুসুমের বংশের কেউ পাগল ছিলো, এমন কথা উপন্যাসে জানা যায় না। কুসুমের গায়ের জোর আছে, গলার জোরও কম নয়। তবে সে সাধারণত যেচে কারো সঙ্গে ঝগড়া বাঁধায় না, কেউ তার সঙ্গে লাগতে এলে সে ছেড়ে কথা কয় না। তার মধ্যে বেশ কিছু খাপছাড়া ব্যাপার লক্ষ করা গেলেও সাধারণত সে নিরীহই। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা :

> বকাবকি করিলে সব সময় কানেও তোলে না, নিজের মনে ঘরের কাজ করিয়া যায়। কাজ করিতে ভালো না লাগিলে খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়া তালবনে তালপুকুরের ধারে ভূপতিত তালগাছটার গুঁড়িতে চুপচাপ বসিয়া থাকে। (মানিক, ১৯৯৫ : ১৯২)

পরানের স্ত্রী কুসুম যে শশী ডাক্তারকে ভালোবাসে, তাকে একান্তভাবে পেতে চায়, অথবা শশীও যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কুসুমকে অবচেতন মনে ভালোবাসে – এ সংবাদ তাদের দুজনের কারো কাছেই সুস্পষ্ট নয়। কিছুটা হয়তো তারা আঁচ করে কিন্তু পুরোপুরি তারা বোঝে না।

শশীর সাথে একান্তে দুটো কথা বলার সুযোগ কুসুম ছাড়ে না – বরং সুযোগ না এলে তা তৈরি করে নিতেও সে পারদর্শী। জ্বরগ্রস্ত ননদ মতিকে দেখে এইমাত্র বেরিয়ে আসা শশীর পিছু নেয় কুসুম এবং নির্জন বেগুন ক্ষেতের বেড়ার পাশ থেকে সে ডেকে বলে, "ছোটবাবু, শুনুন! পরানের বৌ বলে যে ডাকলেন আজ? পরানের বৌ বললে আমার গোসা হয় ছোটবাবু।" (মানিক, ১৯৯৫ : ১৯৩)

কুসুম শশীর কাছে কুসুম হিসেবেই পরিচিত হতে চায়, কারো স্ত্রীর পরিচয়ে নয় :

> সে গড়গড় করে মুখস্থ বুলির মতো একরাশ তোষামোদের কথা বলে যায় কুসুম, শশী শোনে, তার মন লাগে না। "কত বছর আজ সে কুসুমের এমন পাগলামি দেখিতেছে। এর এইসব খাপছাড়া কথার ব্যবহারে একটা যেন মিষ্টি ছন্দ আছে। (মানিক, ১৯৯৫ : ১৯৩-১৯৪)

কুসুম কেন একান্তে ছুটে আসে, কেন এই তোষামুদে বাক্যালাপ করে, কেন তার এইসব 'পাগলামি', 'খাপছাড়া ব্যবহার' তা পুরোপুরি যেমন সে জানে না, তেমনি শশী ডাক্তারেরও অজানা, কেন সে কুসুমের ব্যবহারের ভেতর 'মিষ্টি ছন্দ' খুঁজে পায়। লিবিডো এভাবেই মানুষকে তাড়িত করে। লিবিডোতাড়িত, পীড়িত মানুষের এ এক অপ্রতিরোধ্য পদচারণা, এ এক মধুর লজ্জা। এই দ্বিধা-লজ্জা-সংশয়, এই আধো জানা-আধো অজানা অনুভূতিকে রবীন্দ্রনাথ রূপ দিয়েছিলেন একটি গানে –

> তোমার দ্বারে কেন আসি ভুলেই যে যাই, কতই কী চাই দিনের শেষে ফিরে এসে লজ্জা যে পাই। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৬৪)

একাদশীর দিন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে সারাদিন উপোস ছিল কুসুম, তারই ধারাবাহিকতায় তার শুরু হয় কথিত 'পেটব্যথা'। শীতের রাতে 'কলে' যাবার মতো পেশাদারিত্ব যদিও শশী অর্জন করতে পারেনি, তবু রোগী যেহেতু কুসুম, তাই তাকে অগত্যা যেতে হয়। রোগীর ভাবে-ভঙ্গিতে ডাক্তার বুঝতে পারে, রোগীর কী বৃত্তান্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনাটি বেশ সরস :

> পেটের ব্যথাটা বড় রহস্যময় অসুখ। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উপায় নাই, সত্য কি মিথ্যা বুঝিবার উপায় নাই, থার্মোমিটার স্টেথোস্কোপ কোনোটাই কাজে লাগে নাই। রোগী যা বলে তা-ই সই। ব্যথাটা ডান দিকে বলিলে ডান দিকে, ঝিলিক-দেওয়া ব্যথা বলিলে ঝিলিক-দেওয়া ব্যথা, চন্‌চনে একটানা ব্যথা বলিলে চন্‌চনে একটানা ব্যথা! সন্দেহ করিবার যো নাই। (মানিক, ১৯৯৫ : ২২১)

কুসুমের মুখে কথিত 'পেটব্যথার' বিবরণ শুনে শশী ডাক্তার বাড়ি গিয়ে অষুধ পাঠিয়ে দেয়। শশী অষুধ নিয়ে নিজে কেন এলো না – এই ক্ষোভে কুসুম 'আগুন হইয়া আছে'। 'মরি নি। এই আপনার টাকা।' বলে সত্য সত্যই আঁচলে বাঁধা দুটি টাকা শশীর সামনে রেখে দেয়। চারদিন পর কুসুম শশী ডাক্তারের বাড়ি আসে ক্ষমা চাইতে। 'চুপিচুপি চোরের মতো' শশীর সাধের গোলাপচারাটি দু পায়ে মাড়িয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে ফিসফিস করে কুসুম ডাকে, 'ছোটবাবু শুনুন'। এ কথা সে কথার পরে সে শশী ডাক্তারের শোবার ঘর দেখার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। ঘরে ঢোকার পর ওদিকের দাওয়ায় শশীর বাবা বসে আছেন জানার পর অবলীলায় সে বলে, 'তবে দরজা বন্ধ করে দিন। দেখতে পান যদি?'

শশীর জন্যই কুসুম বাবার বাড়ি যেতে চায় না। আবার যখন শশীর প্রতি তার ক্ষোভ-অভিমান প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সে বাবার বাড়ি যাবার জন্য পাগল হয়ে যায়। এক বর্ষায় কুসুমকে নিয়ে যাবার জন্য তার বাবা এসেছেন। অগত্যা কুসুমকে তাই ছলনার আশ্রয় নিতে হয় :

> সেইদিন তালপুকুরের ধারে কুসুম কেমন করিয়া পড়িয়া গেল সে-ই জানে। বলিল, 'কোমরে চোট লাগিয়াছে আর হাতটা গিয়াছে ভাঙিয়া। কি করে যাব তোমার সঙ্গে? আমি তো যেতে পারব না বাবা! পুজোর সময় এসে আমায় নিয়ে যেও।'
>
> কুসুমের বাবা অত্যন্ত আফসোস করিয়া বলিল, 'কতকাল যাওয়া হয় নি, তোর মা কাঁদাকাটা করেন কুসি। দুটো দিন বরং দেখে যাই, ব্যথাটা যদি কমে।'
>
> কুসুম বলিল, 'দুচার দিনে এ ব্যথা কি কমবে বাবা? কোমরের ব্যথায় নড়তে পারি না। হাড়-টাড় কিছু ভেঙেছে নাকি কে জানে!'

> হাতটা সত্য সত্যই মচকাইয়া গিয়াছিল। শশী আসিয়া পরীক্ষা করিবার সময় এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ইচ্ছে করে পড় নি তো বৌ?'
>
> 'কি যে বলেন ছোটবাবু! ইচ্ছে করে পড়ে কেউ কোমর ভাঙে?'
>
> 'হাতে তবে তোমার কিছু হয় নি, শুধু কোমর ভেঙেছে, না?'
>
> 'হাতও ভেঙেছে' – কুসুম বলিল।
>
> শশী হাতটা নাড়িয়া-চাড়িয়া বলিল, 'কই, বেশি ফোলে নি তো?'
>
> কুসুম রাগিয়া বলিল, 'আবার কি ফুলবে ছোটবাবু, ফুলে কি ঢাক হবে? (মানিক, ১৯৯৫ : ২৬৪)

পরদিন বর্ষণমুখর দুপুরে কুসুম শশী ডাক্তারের বাড়িতে উপস্থিত হয় হাতের ব্যথার অষুধ নেবার নাম করে :

> শশী বলিল, 'হাতে এমন কি ব্যথা হল যে এ বৃষ্টি মাথায় করে ওষুধ নিতে এলে? এলেই বা কি করে? কোমর না তোমার ভেঙে গেছে?
>
> কুসুম অস্পষ্ট ভাবে বলিল, 'কষ্ট করে এলাম'। 'কেন তা এলে? বিকেলে আমিই তো যেতাম।' 'সইতে পারি না ছোটবাবু। (মানিক, ১৯৯৫ : ২৬৪)

কুসুমের আবেগ-উচ্ছ্বাসের মূল্য না দিয়ে শশী বরং যখন তাকে কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে জ্ঞানদান করার জন্য বলে, 'আমরা ছেলেমানুষ নই, ইচ্ছে হলেই একটা কাজ কি আমরা করতে পারি? বুঝে-সুঝে কাজ করা দরকার।' – তখন কথার মোড় ঘুরিয়ে কুসুম হঠাৎ বলে, 'হাতে ব্যথা বলে ওষুধ নিতে এলাম, এসব আমাকে কি শোনাচ্ছেন?' এবং তারপর সে দরজা খুলে বৃষ্টির মধ্যে নেমে যায়।

শশীর ওপর রাগ করে দু দিন পর সে বাবার বাড়ি চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পিতৃগৃহে যাত্রাপথে আটঘাট বেঁধে তার সফরসঙ্গী হওয়া শশীকে দেখে সে সব অভিমান ভুলে যায় :

> আড়চোখে একবার বাপের দিকে চাহিয়া কুসুম বলিল, 'আমার জন্য এলেন আজ, না?'
>
> শশী বলিল, 'হ্যাঁ।'
>
> গভীর সুখে কুসুমের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তবু নিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখের সঙ্গেই বলিল, 'ভেবেছিলাম বাপের বাড়ি গিয়ে ক'মাস থাকব, তা আর হবে না বুঝতে পারছি। (মানিক, ১৯৯৫ : ২৬৬)

শশী ডাক্তারও গাওদিয়া গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে পারে না। কলকাতা থেকে লেখাপড়া করা শশী আধুনিক, শহুরে জীবনের প্রতি সতৃষ্ণ থাকলেও তার গ্রাম ছাড়া হয় না। কারণটি স্পষ্ট করেই বলেছেন ঔপন্যাসিক :

> এখানকার মশকদষ্ট মৃত্তিকালীন জীবন এই সান্ত্বনার জন্য শশীর সহ্য হইয়া আসিয়াছিল যে যখন খুশি গ্রাম ছাড়িয়া যেখানে খুশি গিয়া মনের মতো করিয়া জীবনটা সে আরম্ভ করিতে পারে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিপুলতা অবশ্য কমিয়া যায় নাই। শশীর স্বাধীনতাও হরণ করে নাই কেহ। তবু শশীর মনে হয় চিরকালের জন্য সে মার্কা-মারা গ্রাম্য ডাক্তার হইয়া গিয়াছে – এই গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবার শক্তি নাই। নিঃসন্দেহে এ জন্য দায়ী কুসুম। (মানিক, ১৯৯৫ : ২৩১)

কুমুদ যখন মতিকে বিয়ে করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন শশী এবং কুসুমের প্রতিক্রিয়া পাঠক বেশ উপভোগ করে। যৌবনবতী, ছিপছিপে, সুন্দরী মতির প্রতি সহজাত আকর্ষণের কারণে সে বন্ধু কুমুদকে রীতিমতো ঈর্ষা শুরু করে। 'উপায় থাকিলে কুমুদকে সে তাড়াইয়া দিত।' প্রবল ঈর্ষায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যখন সে নিজেই মতিকে বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষা কুসুমের কাছে প্রকাশ করে, তখন মেয়েলি ঈর্ষায় কুসুমের অন্ধ হবার পালা। তীব্র চাপা গলায় তখন কুসুম বলে, "আপনি করবেন মতিকে বিয়ে! জীবনটা আপনার একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে না?" (মানিক, ১৯৯৫ : ২৪৩)

দৃশ্যপটে প্রতিদ্বন্দ্বী আসার পরে, বিশেষ করে শশী মতিকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করার পর দুর্বোধ্য কুসুম তার আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা অনেকখানি স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে শুরু করে। জোছনা রাতে স্বামিগৃহের আঙিনায় দাঁড়িয়ে সে প্রথমবারের মতো স্পষ্ট করে বলে : "এমনি চাঁদনী রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু।" (মানিক, ১৯৯৫ : ২৪৪) আরো বলে : "আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?" (মানিক, ১৯৯৫ : ২৪৪)

এই রোম্যান্‌টিক মুহূর্তের নিবিড় কামনা-বাসনা প্রকাশ করার পর কাঙ্ক্ষিত পুরুষটির কাছ থেকে কোনো অনুকূল সাড়া পায়নি কুসুম, বরং সে পায় চাপা ধিক্কার : "শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?" (মানিক, ১৯৯৫ : ২৪৪)

কুসুমের আবেগ-উচ্ছ্বাস-স্বপ্নাচ্ছন্নতার রেশ যায় কেটে।

শশী চরিত্রটির একটি বিশেষ দিক এই যে, সে যখন তখন অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই তার আবেগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে ফেলে – স্থান-কাল-পাত্রের ভেদ সে করে না। এটা তার সহজাত প্রকাশভঙ্গিও বলা যায়। সে যখন কথা বলে, তখন তার কথার অর্থ কোন্ পর্যন্ত বিস্তারিত হচ্ছে, সে তা ভেবে দেখে না। কুসুম যতোটা চাপা স্বভাবের, শশী ততোটাই মুখর। তার আবেগের ধারাবাহিকতা বা সঙ্গতি কোনটাই লক্ষ করা যায় না। কুসুম যখন গভীর আবেগে বলেছিল, "আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?" তার জবাবে রূঢ়তার সঙ্গে সে বলেছিল, 'শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?' তারপর বাবার বাড়ি যাওয়া ঠেকানোর জন্য সে তালপুকুর পারে ইচ্ছা করে আছাড় খেয়ে হাত মচকে ফেলে সেই ব্যথার অষুধ আনার ছল করে

যখন কুসুম বৃষ্টিমুখর দুপুর বেলা তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়, তখন শশী তার আবেগের কোনো মূল্য না দিয়ে বরং তাকে সংযম শিক্ষা দেবার অপচেষ্টা করেছিল। অথচ তারপরে অসুস্থ পরানকে দেখতে গিয়ে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে কুসুমের প্রতি আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে : "তোমার হাসি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায় বৌ। লোকজনের ভিড়ে জ্বালাতন হই, তুমি ছাড়া এমন করে আমার কাছে আর কেউ হাসে না। আমার একটিও বন্ধু নেই বৌ।" (মানিক, ১৯৯৫ : ২৯৮)

বড়ো নির্লজ্জ ও খাপছাড়া লাগে শশীর ব্যবহার। সে অন্যকে নাচায়, নিজে নাচে না। সে অন্যকে ভ্রান্তির মধ্যে তাড়িত করে, অথচ সেই নিমজ্জমান ব্যক্তিটি উদ্ধারের আশায় হাত বাড়ালে তার প্রতি কোনো দায় সে অনুভব করে না।

পরানের বাড়িতে গিয়ে চকিত কথায় আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে কুসুমকে বিচলিত করে শশী কর্মব্যস্ততার দোহাই দিয়ে কেবল উঠি উঠি করে। কুসুম হয়তো তাকে আরো একটুখানি বসতে বলে। অনিচ্ছুক শশী বলে : "সময়ে কাজ না করলে কাজ নষ্ট হয়, বসে গল্প করা পালায় না। তুমি রইলে আমিও রইলাম– সে তো ন বছর ধরেই আছি। এক-আধ দিন নয়।" (মানিক, ১৯৯৫ : ২৯৮) বলে কুসুম গাঢ় অভিমানে উঠে চলে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে শশীর অন্তর্চিত্ত উন্মোচন করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভাবে :

> তালবনের উঁচু টিলাটার উপর দাঁড়াইয়া একদিন সূর্যাস্ত দেখিবার সময় শশীর অন্তর বড় ব্যাকুল হইয়াছিল, অভূতপূর্ব ভাবাবেগে সে থরথর করিয়া কাঁপিয়াছিল, আজ অপরাহ্ণ বেলায় গৃহচ্ছায়ায় একা দাঁড়াইয়া সে যেন তেমনি বিহ্বল হইয়া গেল অন্য এক ভাবাবেশে। এ তো গ্রাম শশী, খড়ের চালা দেওয়া গ্রাম্য গৃহস্থের এই গোবর-লেপা ঘর, যে রমণী কথা বলিয়া চলিয়া গেল গায়ে তার ব্লাউজ নাই, কেশে নাই সুগন্ধী তেল, তার জন্য বিবর্ণ মুখে এত কষ্ট পাইতে নাই! ওর আবেগ তো গেঁয়ো পুকুরের ঢেউ! জগতে সাগরতরঙ্গ আছে। (মানিক, ১৯৯৫ : ২৯৯)

পুতুলনাচের ইতিকথায় দেখা যায় : কুসুম যতোদিন শশীর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে, ততোদিন তার কোন গুরুত্ব শশী দেয়নি – গুরুত্ব তখনই সে দিতে শুরু করেছে, যখন থেকে তার প্রতি কুসুমের আগ্রহে ভাটা পড়েছে। কুসুম যখন তার অস্পষ্টতা নিয়ে শশীর দিকে এগিয়ে গেছে, তখন শশীর শীতলতা তার সকল উষ্ণতাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। অনুরূপভাবে শশী আবার যখন তার স্পষ্টতা নিয়ে কুসুমের দিকে এগিয়ে গেছে, তখন কুসুমের ক্ষমাহীন কাঠিন্যের দেয়ালে বাধা পেয়ে তা পরিণামে ব্যর্থ হয়ে যায়। *পুতুলনাচের ইতিকথা* মূলত কুসুম ও শশী ডাক্তারের ব্যর্থতার ইতিকথা।

একদিন খুব ভোর বেলা শশী বাড়ির সামনের রাস্তায় নেমে দেখতে পায় : কুসুমও তার বাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। কুসুম শশীকে দেখে কিন্তু এগিয়ে আসে না। উপন্যাসে এখান থেকেই শুরু হয়েছে একটি নতুন বাঁক। শশী নিজেই এগিয়ে যায়। এ

কথা সে কথা বলার পর সে স্পষ্ট করেই বলে : "আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল যেন কমে যাচ্ছে বৌ।" (মানিক, ১৯৯৫ : ৩০০)

কুসুমও এখন আর কোনো ভণিতা করে না, সরাসরিই বলে :

> ওমা তাই নাকি? তা হবে হয়তো! একটা কমে একটা বাড়ে, এই তো নিয়ম জগতের। আকাশের মেঘ কমে নদীর জল বাড়ে – নইলে কি জগৎ চলে ছোটবাবু? (মানিক, ১৯৯৫ : ৩০০)

অশান্ত মন সংযত করে, আবেগ অবদমিত করে কুসুম শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বাবার বাড়ি চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। সে বুঝতে পারে : শশীর আশা আর করা চলে না। অথচ এই সংবাদে শশী এতোটাই বিচলিত হয়ে উঠলো যে, যে শশীর ঝোঁকের মাথায় কাজ করার অভ্যাস কোনো দিনই ছিলো না, সেই শশীই সকাল বেলা কোনো বাছ বিচার না করে সোজা পরানের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। কুসুমকে সে তালবনে ডেকে নিয়ে যায়। কিন্তু আজ তালবনে যে কুসুমকে সে দেখে, এ কুসুম তার চিরপরিচিত কুসুম নয় – ঘটনার প্রতিঘাতে বদলে যাওয়া এ এক নতুন কুসুম। শশী স্পষ্টতই ভড়কে যায়। সে বলে, "তোমার কি হয়েছে বুঝতে পারছি না বৌ।" (মানিক, ২০০১ : ৩০৫)

কুসুম জবাবে বলে, "কি করে বুঝবেন? মেয়েমানুষের কত কি হয়, সব বোঝা যায় না। হলেনই বা ডাক্তার? এ তো জ্বর জ্বালা নয়।" (মানিক, ১৯৯৫ : ৩০৫)

শশীর 'মিথ্যে করে ভাঙা হাত দেখাতে বৃষ্টি মাথায় করে যেতে পার, এতবড় একটা খবর দেবার জন্য একবার যেতে পারলে না?' – কথার প্রত্যুত্তরে কুসুম ক্রোধের যে ভঙ্গিটি করেছিল, ঔপন্যাসিক তা বর্ণনা করেছেন এ-ভাবে :

> দুহাতে মুখের দুপাশের আলগা চুলগুলি পিছনে ঠেলিয়া দিয়া এমন তীব্র দৃষ্টিতে শশীর দিকে চাহিল যে মনে হইল শশী যেন দুরন্ত অবাধ্য শিশু, এখুনি কুসুম তাকে একটা চড়চাপড় মারিয়া বসিবে। এমন তো ছিল না কুসুম! শশী কবে তাকে অপমান না করিয়াছে, কবে মান রাখিয়াছে তার অভিমানের, কবে এমন কথা বলিতে ছাড়িয়াছে যা শুনিলে গা জ্বলিয়া যায় না? কোনোদিন রাগ সে করে নাই, ভর্ৎসনার চোখে চাহে নাই। আজ এই সামান্য অপমানে সে একেবারে ফুঁপিয়া উঠিল বাঘিনীর মতো! (মানিক, ১৯৯৫ : ৩০৬)

কুসুমের ভাষায় আজ কোন দুর্বোধ্যতা নেই, সে সরাসরিই বলে : "দশ বছর খেলা করেও সাধ মেটে নি? আমরা মুখ্য গেঁয়ো মেয়ে ওসব খেলার মর্ম তো বুঝি না, কষ্টে মরে যাই।" (মানিক, ১৯৯৫ : ৩০৭)

শশীর কাছে মনের আবেগকে এমন স্পষ্টভাবে কুসুম কোনো দিন প্রকাশ করেনি। বড়ো শক্ত মেয়ে সে। জোরে জোরে শ্বাস টেনে আর আঁচলে চোখ মুছে সে আবেগকে সংহত

করে। কিন্তু শশীর স্থৈর্য, স্বস্তি, সংযম তখন আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। ঔপন্যাসিকের ভাষায় :

> কুসুম আর কিছুক্ষণ চোখের জল ফেলিলে যে শশী হঠাৎ ক্ষ্যাপার মতো বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে দু'হাতে জড়াইয়া ধরিত তাতে সন্দেহ ছিল না, ... কুসুমের যে শরীরটা আজ অপার্থিব সুন্দর মনে হইতেছিল তার সমস্তটা শশী জড়াইয়া ধরিতে পারিল না, হঠাৎ করিল কি, খপ করিয়া কুসুমের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩০৭)

কুসুম অবাক হয়। তার কথায় স্তব্ধ হয়ে যায় শশী। সে বলে ওঠে : "কতবার নিজে যেচে এসেছি, আজকে ডেকে এনে হাত ধরা-টরা কি উচিত ছোটবাবু? রেগে-টেগে উঠতে পারি তো আমি? বড় বেয়াড়া রাগ আমার।" (মানিক, ১৯৯৫ : ৩০৭)

কুসুমের রূঢ় উত্তর শুনে শশীর মুখ শুকিয়ে যায়। তবু সে হাত ছাড়ে না। শশীর মধ্যেও তখন জেগে উঠেছে অচেনা, নতুন একজন শশী। আকুল হয়ে সে কুসুমকে বলে :

> আমার সঙ্গে চলে যাবে বৌ?'
>
> 'চলে যাব? কোথায়?'
>
> 'যেখানে হোক। যেখানে হোক চলে যাই, চল আজ রাত্রে।
>
> 'কুসুম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল 'না'।
>
> 'শশী ব্যাকুলভাবে কহিল, 'কেন? যাবে না কেন?'
>
> কুসুম শুধু বলিল, 'কেন যাব?'
>
> শশী বোকার মতো, শিশুর মতো বলিল, 'কেন যাবে? কেন যাবে মানে কি কুসুম?
>
> 'আজ নাম ধরে কুসুম বললেন!'– বলিয়া ছোট বালিকার মতো মাথা দুলাইয়া জ্বলজ্বলে চোখে শশীর অভিভূত ভাব লক্ষ করিতে করিতে কুসুম বলিল, 'কি করে যে শুধোলেন কেন যাব! আপনি বুঝি ভেবেছিলেন যেদিন আপনার সুবিধে হবে ডাকবেন, আমি অমনি সুড়সুড় করে আপনার সঙ্গে চলে যাব? কেউ তা যায়?'
>
> শশী অধীরভাবে বলিল, 'একদিন কিন্তু যেতে।'
>
> কুসুম স্বীকার করিয়া বলিল, 'তা যেতাম ছোটবাবু! স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলেই ছুটে যেতাম। চিরদিন কি একরকম যায়? মানুষ কি লোহার গড়া, যে চিরকাল সে একরকম থাকবে, বদলাবে না? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩০৭)

প্রবল ঘোরের মধ্যে থাকলেও শশী ডাক্তারের চৈতন্য তখন স্বচ্ছ, পরিস্রুত-পরিচ্ছন্ন তার আত্মোপলব্ধিও যথার্থ। যে কুসুমকে সে গত দশ বছর ধরে বুঝতে পারে নি, তার আদ্যোপান্ত হঠাৎ সে বুঝতে পারে। নিজেকেও সে মূল্যায়ন করতে পারে। অনুতপ্ত, অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত, কাতর শশী ডাক্তারের সরল স্বীকারোক্তি :

> অনেক বড় বড় কথা তো বললে, একটা ছোট কথা কেন তুমি বুঝতে পার না? নিজের মন কি মানুষ সব সময় বুঝতে পারে বৌ? অনেকদিন অবহেলা করে কষ্ট দিয়েছি বলে আজ রাগ করে তার শোধ নিতে চলেছ, এমন তো হতে পারে আমি না বুঝে তোমায় কষ্ট দিয়েছি, তোমার' পরে কতটা মায়া পড়েছে জানতে পারি নি? তুমি চলে যাবে শুনে এতদিনে আমার খেয়াল হয়েছে? তাছাড়া তোমার কথাই ধরি, তুমি বললে মানুষ বদলায় – বেশ আমি অ্যাদ্দিন তোমার সঙ্গে খেলাই করেছি, আজ তো আমি বদলে যেতে পারি বৌ? (মানিক, ১৯৯৫ : ৩০৮)

শশীর এই সরল, অকপট, করুণ নিবেদনও কুসুমের ক্ষমাহীন কাঠিন্যের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ে। একদা কাঙ্ক্ষিত পুরুষের আবেদন-নিবেদন তাকে টলাতে পারে না। এক পর্যায়ে শশী কুসুমের এই বিরূপ হয়ে ওঠার কারণ জানতে চায়। কুসুম বলে :

> কুসুম ম্লান মুখে বলিল, 'আপনাকে কি বলব ছোটবাবু, আপনি এত বোঝেন। লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না? সাধ আহ্লাদ আমার কিছু নেই, নিজের জন্যে কোনো সুখ চাই না – বাকি জীবনটা ভাত রেঁধে ঘরের লোকের সেবা করে কাটিয়ে দেব ভেবেছি – আর কোনো আশা নেই, ইচ্ছে নেই, সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটবাবু। লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম, অ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছি সেটা কি। কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩০৮)

কুসুমের কথার তাৎপর্য শশী বেশ বুঝতে পারে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে কুসুম তার জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিলো, তারপর ধীরে ধীরে তার 'উন্মাদ ভালোবাসা' 'নির্জীব' হয়ে এসেছে। সে বুঝতে পারে, কুসুমের এ পরিণতিই স্বাভাবিক। ঔপন্যাসিকের ভাষায় :

> গাঁয়ের মেয়ে ঘরের বৌ কুসুম, মনোবাসনা কতদূর অদম্য হইয়া ওঠায় দিনের পর দিন নৈবেদ্যের মতো নিজেকে শশীর কাছে সে নিবেদন করিয়া চলিয়াছিল এখন শশী তা বুঝিতে পারে, কুসুমের অমন ভয়ানক উপবাসী ভালবাসা যে এতকাল সতেজে বাঁচিয়া ছিল তাই তো কল্পনাতীতরূপে বিস্ময়কর। আপনা হইতেই যে প্রেম জাগিয়াছিল, আপনা হইতে স্বাভাবিক নিয়মে আবার তা লয় পাইয়াছে। শশীকে না দেখিয়া এখন কুসুমের দিন কাটিবে, শশীকে বাদ দিয়া কাটিবে জীবন। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩০৯)

কুসুম চলে যায়। নির্জীবের মতো সে তার প্রাত্যহিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকার অপচেষ্টা করে। বজ্রাহত বটগাছের ব্যঞ্জনা ছায়াপাত করে শশী ডাক্তারের যাপিত জীবনে : "মামলা করিতে শশী বাজিতপুরে যায়, ফিরিবার পথে চোখ তুলিয়া দেখিতে পায় খালের ধারে বজ্রাহত একটা বটগাছ শুকনো ডালপালা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে"। (মানিক, ১৯৯৫ : ৩২৪)

ফ্রয়েডীয় বিবেচনায় মানুষ সবাই কম-বেশি অসুস্থ। অবচেতন মনের অদম্য পাশব শক্তির তাড়নায় মানুষ প্রতিনিয়ত অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মানুষ আপন অন্তরালে সবচেয়ে দুর্গম, তার মন জৈবিক কামনা বাসনার দুর্ভেদ্য অরণ্য। "মানব-মন যুক্তির বাধ্য নয়, অন্তরবাসী যৌন-দেবতার অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সে চালিত হয় (অচ্যুত, ১৯৬৮ : ৩৫৫)।" একদিকে নিয়তির অমোঘ আকর্ষণে, অন্যদিকে অবচেতন মনের লিবিডোর টানাপোড়েনে শশী ডাক্তার নিজেই ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। 'নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত পুতুল' (অশ্রুকুমার, ২০০১ : ২২২) শশী মানুষের রোগ খুঁজে বেড়ায় "অথচ সে নিজেই যে কখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছে তা সে জানতে পারছে না।" (অচ্যুত, ১৯৬৮ : ৩৬১) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত :

> পুতুলনাচের ইতিকথার শশীর সমস্যা নিশ্চয় যৌন সমস্যা নয়। সম্পূর্ণই শশীর মনের সমস্যা, শশীর সত্তার মূলীভূত সমস্যাই এ উপন্যাসের বিষয় – গাওদিয়ার সমস্ত বিড়ম্বনার সূত্রে শশীর জীবনের বিড়ম্বনা এক হয়ে যাওয়ার সমস্যা। (সরোজ, ২০০১ : ৩৪৫)

বলাবাহুল্য, শশীর সমস্যা তার জৈবিক তৃষ্ণা এবং অবচেতন মনের অবদমন থেকে সৃষ্ট।

মতি ও কুমুদের মুগ্ধ ভালোবাসার মূলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের জৈবিক আকর্ষণই মুখ্য। ভবঘুরে কুমুদ গ্রাম্য কিশোরী মতির রূপে ও গুণে মুগ্ধ। উভয়ের মনেই প্রবল ঘোর। তাদের এই প্রেমের ব্যাপারটি কুসুম ও শশীর মধ্যেও প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। কুমুদের মতো চালচুলোহীন এক ছোকড়ার প্রেমে মজে আছে মতি – ব্যাপারটাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না শশী। কারণ মতির প্রতি শশীর এবং শশীর প্রতি মতির এক ধরনের দুর্বলতা প্রচ্ছন্ন ছিল। মতির বিয়ের সম্ভাবনায় শশী তাই ঈর্ষাবোধ না করে পারে না। লেখকের বর্ণনা :

> এ চিন্তায় শশী লজ্জা পায়। মতির জন্য তার মনে বাৎসল্য-মেশানো এক প্রকার আশ্চর্য মমতা আছে, মতিকে কুমুদের বৌ হওয়ার অনুপযুক্ত মনে করিতে তাহার কষ্ট হয়। সেদিন বিকালে মতির সঙ্গে শশীর দেখা হইল। মতি একডালা কুমড়া ফুল লইয়া তাহাদেরই বাড়ি আসিয়াছিল। শশীকে সে কথাটা জানানো হইয়াছে, কুমুদ হয়তো মতিকে এ সংবাদ দিয়াছিল। শশীকে দেখিয়া মুখখানা তাহার রাঙা হইয়া উঠিল। তারপর একটু হাসিল মতি – হঠাৎ লজ্জা পাইলে এ বয়সে ঠোঁটে একটু হাসির ঝিলিক দিয়া যায়। মতির মুখখানা আজ শশীর অসাধারণ সুন্দর মনে হইল। সে ভাবিল, হয়তো কুমুদ ভুল করে নাই। হয়তো সত্যই একদিন সে মতিকে রূপে-গুণে অতুলনীয়া করিয়া তুলিবে।
>
> মতি চলিয়া গেলে কুমুদের এই শক্তিতে কিন্তু শশীর আর বিশ্বাস রহিল না। খনি গর্ভের হীরার মতোই বটে মতি – তাকে একদিন অনুপমা ও জ্যোতির্ময়ী করিয়া

> তোলাও সম্ভব, কিন্তু কুমুদ তাহা পারিবে না। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিবার প্রতিভা আছে কুমুদের – স্বপ্নকে সফল করিবার তপস্যা নাই। মতির মুখের পেলব ত্বকে দুদিনে সে দুঃখের রেখা আনিয়া দিবে।
>
> মনটা শশীর খারাপ হইয়া থাকে। কুমুদের প্রতি সে বিতৃষ্ণা বোধ করে সীমাহীন। এ কি বন্ধুর কাজ, বন্ধুর বাড়ি আসিয়া তাহার স্নেহের পাত্রীর সঙ্গে গোপনে ভালবাসার খেলা করা? উপায় থাকিলে কুমুদকে সে তাড়াইয়া দিত। কিন্তু কুমুদের কথা শুনিয়া আর তো মনে হয় না মতির কোনো দিকে আশা-ভরসা আছে। কুমুদের সম্বন্ধে মতির উৎসুক প্রশ্ন, কুমুদকে দেখিবার আশায় মতির কলিকাতা যাওয়ার আগ্রহ, সব এখন শশীর মনে পড়িতে থাকে। প্রেম? কুমুদের জন্য এতখানি প্রেম জাগিয়াছে মতির বুকে? তাছাড়া, হয়তো মতির বুকভরা প্রেমই শুধু নয় – কুমুদকে বিশ্বাস নাই, জীবনটা কুমুদের আগাগোড়া অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ।
>
> কি করিবে শশী ভাবিয়া পায় না। (মানিক, ১৯৯৫ : ২৪২-২৪৩)

শশী ডাক্তারের এই মানসিক অবস্থাটি, বলাবাহুল্য, কুসুমের জন্য প্রীতিদায়ক নয়। শশীকে জীবনে একান্তভাবে পেতে চায় যে কুসুম, সে মতির প্রতি শশীর এই আগ্রহ এবং কুমুদের প্রতি এই ঈর্ষায় স্বস্তি বোধ করতে পারে না। এ পরিস্থিতিতে কুসুম তাই চায় কুমুদ-মতির বিয়ে হয়ে যাক। কুসুম ও শশী যখন কুমুদ ও মতির এই সম্পর্কের পরিণতি নিয়ে একান্তে পরামর্শ করে, তখন তাদের বিয়ে ছাড়া অন্য কোনো সমাধান কুসুম ভাবতেই পারে না। একান্ত প্রিয়জনের হৃদয়ে অন্য নারীর প্রতি ভালোবাসার সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুসুম তখন মরিয়া হয়ে ওঠে। কুসুমের এই ব্যাকুলতা শশী ডাক্তারের ভালো লাগে না। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা :

> সন্ধ্যার পর কুসুমের সঙ্গে শশী এ বিষয়ে পরামর্শ করার সুযোগ পাইল। আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছিল। ঘরের চালা যে জ্যোৎস্নার ছায়া ফেলিয়াছিল সে ছায়ায় দাঁড়াইয়া অনেক কথা বলিবার পর শশী বলিল, 'একটা উপায় আছে বৌ।'
>
> 'কি উপায়?' – কুসুম জিজ্ঞাসা করিল।
>
> আমি মতিকে বিয়ে করতে পারি।'
>
> 'এই উপায়!' – কুসুম হাসিয়া ফেলিল।
>
> শশী কিন্তু হাসিল না, বলিল, 'হাসির কথা নয় বৌ। কুমুদের হাতে ওকে সঁপে দিতে সত্যি আমার ভাবনা হচ্ছে।'
>
> কুসুম গম্ভীর হইয়া বলিল, 'সে আপনি ওকে বোনটির মতো ভালবাসেন বলে। মেয়ে, বোন – এদের বিয়ে দেবার সময় মানুষের এ রকম ভাবনা হয়।'
>
> শশী তবু বলিল, 'আমি যদি মতিকে বিয়ে করি – '

> 'যদি করেন! যদি!' তীব্র চাপা গলায় এই কথা বলিয়া কুসুম পরক্ষণেই হাসিয়া ফেলিল, 'সংসারে অত যদি চলে না ছোটবাবু। আপনি করবেন মতিকে বিয়ে! জীবনটা আপনার একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে না?'
>
> তখন শশী বলিল, 'কুমুদ অবশ্য একেবারে অমানুষ নয়, রোজগার-পাতিও মন্দ করে না – '
>
> কুসুম বলিল, 'মতির ভাগ্যি ওকে কুমুদবাবুর পছন্দ হয়েছে। পড়ত গিয়ে কোনো চাষার ঘরে, দুবেলা চেলাকাঠের মার খেয়ে প্রাণটা ছুঁড়ির বেরিয়ে যেত। অনেক পুণ্যিতে এমন বর জুটেছে ওর।'
>
> 'হোক তবে, তাই হোক। মতি কি বলে বৌ?'
>
> 'কি বলবে? দিন গুনছে।'
>
> দিন গুনিতেছে মতি! গুনুক!
>
> কুসুমের উপর রাগে শশীর মন জ্বালা করিতে থাকে। সেদিন প্রত্যূষে তালবনে কুসুমের মধ্যে যে সরলা বালিকাকে আবিষ্কার করিয়া সে পুলকিত হইয়াছিল, আজ সে কোথায় গেল? (মানিক, ১৯৯৫ : ২৪৩)

পুতুলনাচের ইতিকথায় শশী ডাক্তার ও কুসুমের প্রেম মুখ্য হলেও শশীর প্রতি মতির আগ্রহ, মতির প্রতি শশীর দুর্বলতা এবং এ নিয়ে মতি ও কুসুমের মেয়েলি ঈর্ষাবোধ পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। যেমন শশীর প্রতি মতির আগ্রহ :

> ক. তালবনের তালপুকুরে পদ্ম তুলিতে গিয়া মতি আশা করিতে লাগিল, ছোটবাবু আজ নিশ্চয় আসবে, ছোটবাবুকে একডালা পদ্ম দেব (মানিক, ১৯৯৫ : ২০২)।
>
> খ. মতির ভারি ইচ্ছা, বড়লোকের বাড়িতে শশীর মতো বরের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কাজ নাই, বকুনি নাই, কলহ নাই, নোংরামি নাই, বাড়ির সকলে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, হাসে, তাস-পাশা খেলে, কলের গান বাজায়, আর – আর বাড়ির বৌকে খালি আদর করে। চিবুক ধরিয়া তাহার লজ্জিত মুখখানি তুলিয়া বলে, লক্ষ্মী বৌ, সোনা বৌ, এমন না হলে বৌ? (মানিক, ১৯৯৫ : ২০৫)

মতির প্রতি শশীর আগ্রহ, লেখকের বর্ণনা থেকে :

> শিশিরে এক পশলা বৃষ্টির মতো চারিদিক ভিজিয়া আছে। মতির বিবর্ণপাড় শাড়ি আধভেজা কাপড়ের মতো কোমল দেখাইতেছিল। শশীর মনে হয় শাড়ির নমনীয় স্পর্শে মতি ভারি আরাম পাইতেছে। সকালবেলা রাত-জাগা চোখে মতিকে যেন তার বয়সের চেয়ে অনেক বড় মনে হইতে লাগিল। ওকে দেখিতে দেখিতে সকালবেলা বিড়ি টানার আলস্য আরো মিষ্টি লাগিল শশীর। (মানিক, ১৯৯৫ : ২০৪)

মতির প্রতি শশীর আগ্রহ কুসুমের মনে জাগায় তীব্র ঈর্ষা। ঈর্ষা থেকে সৃষ্টি হয় মেয়েলি ঝগড়া :

> কুসুমের সঙ্গে আজকাল প্রায়ই ঝগড়া বাধে মতির। সকলের অগোচরে মতিকে কুসুম শশীর কথা তুলিয়া অন্যায় পরিহাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।
>
> বলে, 'শরীর খারাপ লাগছে মতি? তাই চুপ করে বসে রয়েছিস? আহা ষাট। ছোটবাবুকে ডাকব? পরীক্ষে করে ওষুধ দেবে?'
>
> মতি বলে, 'কেন লাগতে এলি বৌ? তোর আমি কি করেছি!'
>
> কুসুমবলে, 'চোখ ছল ছল করছে। দেখলে ছোটবাবুর বুক ফেটে যাবে।'
>
> মতি বলে, 'যমের অরুচি। মর্ তুই, মর্।'
>
> কুসুম তবু বলে, 'জানিস লো মতি – রাতে তোর কথা ভেবে ছোটবাবুর ঘুম হয় না। বসে বসে মালা জপ করে, মতি, মতি, মতি। সুদেবের সঙ্গে তোর নিকে হয়ে গেলে ছোটবাবু তালপুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করবে।'
>
> 'তুই তালপুকুরে ডুবে মর্। মরে শাকচুন্নি হয়ে থাক।'
>
> মতি স্থান ত্যাগ করিতে যায়, কুসুমের সঙ্গে সে কথায় পারিবে কেন? কুসুম তাহাকে রেহাই দেয় না। খপ করিয়া মতির হাতটা সে ধরিয়া ফেলে। মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অপলক চোখের তারা স্থির রাখিয়া কথাগুলিকে দাঁতে কাটিয়া কাটিয়া বলে, "লজ্জা নেই তোর? এত বড় ধেড়ে মেয়ে তুই, লজ্জা নেই তোর? পেটে ভাত জোটে না, গয়লার মুখ্যু মেয়ে তুই – ছোটবাবুর তুলনায় তুই ছোটলোক ছাড়া কি! অত তোর পাকামি কিসের। (মানিক, ১৯৯৫ : ২০৫)

পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে গিয়াস শামীম ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণতত্ত্বের প্রভাব লক্ষ করেছেন। তিনি বলেছেন : এ তত্ত্ব পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যতীত মতি-শশী-কুসুমের জীবনযাপনের বিকার, অসংগতি, সংকট ও সংঘাতের কার্যকারণ থেকে যাবে অস্পষ্ট ও অনির্ণীত। (শামীম, ২০০৮ : ৫১)

বায়তুল্লাহ কাদেরী *পুতুলনাচের ইতিকথার* উপমা ও চিত্রকল্প বিশ্লেষণসূত্রে দেখিয়েছেন যে এ উপন্যাসে চরিত্রের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের রূপায়ণে, কখনো চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে চিত্রকল্পাত্মক বর্ণনার মাধ্যমে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। তাঁর ভাষায় :

> 'জাদুঘর মিউজিয়াম' উপমানচিত্রের মাধ্যমে শশীর শোবার ঘরটিকে কুসুমের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। লক্ষণীয়, অতৃপ্তকাম, অচরিতার্থ কুসুমের কাছে শশীর শোবার ঘরের মতো শশীর হৃদয়টিও (বাসরশয্যা?) কি এক প্রাচীন, জড়, স্মৃতিজাগানো, গচ্ছিত, দর্শনশোভন 'জাদুঘর মিউজিয়ামের মতো' নয়?

লোকায়ত ও প্রাকৃত উপমাও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন চরিত্রের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের রূপায়ণে, কখনো চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিল স্বভাবের চিত্রকল্পক বর্ণনায় :

> ভিন্‌দেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন
>
> লাজরক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন।

> বস্তুত কুসুমের জীবনাকাঙ্ক্ষায় শশীর আবির্ভাব এবং অপ্রাপ্তি যেন চন্দ্রবৎ দূরবর্তী ও অস্পষ্ট। আর 'ভিনদেশী পুরুষ' মূলত কুসুমের শশীমুখী পরকীয়া প্রেমেরই অবলম্বন, প্রথম যৌবনের মতো যার উচ্ছ্বাস, চাঁদের (শশী?) আকর্ষণে জোয়ার এসেছে। (বায়তুল্লাহ, ২০০৮ : ১২৫)

সৌমিত্র শেখর *পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় প্রভাব লক্ষ করেছেন। তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> শশী-কুসুমের সম্পর্কে সংকট উপস্থিত। সংকট হবেই। কেননা, শহরে থাকা অবস্থায় শশী যে পুষ্টদানা খাওয়া মেয়েদের দেখেছে, তাদের কথা শুনেছে, হাবভাব পর্যবেক্ষণ করেছে, কুসুমের শরীর অনেকটা সেই নবশিক্ষিতাদের মতো হলেও আর কিছু তার সঙ্গে মেলে না। শশীর কল্পিত নারীমূর্তি আর কুসুম এক নয়। তাই সে প্রতি মুহূর্তে কুসুমের কাছ থেকে দূরে থেকেছে। 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?' – কুসুমের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে শশী খুঁজেছে কুসুমের মন : 'শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?' অথচ, শশী বুঝতে পারেনি, এটাই কুসুমের প্রণয় নিবেদনের লোকায়ত ভাষা। গ্রামীণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রণয় মানেই শরীর কেমন কেমন করা। দেহ বিকোতে আসেনি কুসুম। শশী বরং লোকায়ত অনুরাগ প্রকাশের এই ভাষা বুঝতে পারে না। কুসুমের গোলাপের চারা মাড়ানোর অর্থ শশী বুঝতে পারেনি; বৃষ্টিতে ভিজে শশীর কাছে যাওয়ার পরও শশী কুসুমকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দেহের প্রতি দৃষ্টি কি শশীর পড়েনি? নবীন যুবক। না-পড়াটাই বরং অস্বাভাবিক। বৃষ্টিভেজা কুসুমের শরীরের প্রতি শশীর যে চোখ পড়েনি তেমন তো নয়। মতির দেহও শশীর দৃষ্টির বাইরে যায়নি : 'শশীর মনে হয়, শাড়ীর নমনীয় স্পর্শে মতি ভারি আরাম পাইতেছে।' পাশাপাশি সুন্দরী সেনদিদির চিকিৎসার সময় শশী যে উৎসাহ পেয়েছে পরবর্তীকালে হতশ্রী সেনদিদির প্রতি সে-উৎসাহ না পেয়ে শশী নিজেই লজ্জিত হয়েছে। এ সবই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দোদুল্যমানতা; তার চিত্তসংকট, তার অস্তিত্বসংকট। মানিক-অধীত যৌনবিজ্ঞান, বিশেষ করে ফ্রয়েডীয় দর্শনের প্রভাব এখানে প্রবল। শুধু তাই নয়, সেনদিদিকে যুবক ডাক্তার শশীকে দিয়ে চিকিৎসা করানোতে তার বৃদ্ধ স্বামী যামিনী কবিরাজের অনাগ্রহ, গোপালের নিষেধ এবং সেনদিদির গর্ভজাত সন্তানকে গোপালের প্রতিপালনও (কোন দায়িত্ববোধ থেকে?) ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্বে বিশ্লেষিত হতে পারে। (সৌমিত্র, ২০০৮ : ৩০১-৩০২)

এ ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে : কুসুম-শশী-মতি-কুমুদই শুধু নয়, গোপাল-সেনদিদি, জয়া-বনবিহারী চরিত্রগুলোর আন্তঃসম্পর্কের টানাপোড়েন ও দোলাচলবৃত্তির মূলে সক্রিয় তাদের অবদমিত যৌন কামনা-বাসনার স্তরবহুল তাড়না ও পীড়ন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় যে জীবনের রূপায়ণ করেছেন, এবং যে অখণ্ড জীবনসত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তা ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত।

গ্রন্থপঞ্জি

অচ্যুত গোস্বামী (১৯৬৮)। বাংলা উপন্যাসের ধারা। পাঠভান, কলিকাতা।

আবুল ফজল (২০০১)। পুতুল নাচের ইতিকথা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা. ভূইয়া ইকবাল] বর্ণমিছিল, ঢাকা।

অরূপরতন বসু [অনু.] ১৯৯৯। মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা স্নায়ুরোগ। দীপায়ন। কলকাতা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৮)। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। মর্ডান বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৯)। গীতবিতান। মলি প্রকাশনী, ঢাকা।

অশ্রুকুমার শিকদার (২০০১)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : আদি উপন্যাস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা. ভূইয়া ইকবাল] বর্ণমিছিল, ঢাকা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০১)। মানিক বন্দ্যোপ উপন্যাস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা. ভূইয়া ইকবাল] বর্ণমিছিল, ঢাকা।

গিয়াস শামীম (২০০৮)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি : কেতুপুরের মহাকাব্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা. ভূইয়া ইকবাল] বর্ণমিছিল, ঢাকা। পৃ. ৫২

বায়তুল্লাহ কাদেরী (২০০৮)। মানিকের উপন্যাসে উপমা-চিত্রকল্প। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা. ভূইয়া ইকবাল] বর্ণমিছিল, ঢাকা। পৃ. ১১৮

সৌমিত্র শেখর (২০০৮)। উপন্যাসে বৈজ্ঞানিকতা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা. ভূইয়া ইকবাল] বর্ণমিছিল, ঢাকা। পৃ. ৩০৩-৩০৫